

আঞ্চলিক পরিচয়, চাষাবাদের বিস্তার এবং তৃতীয় নগরায়ণ: যোগাযোগ, মিশ্রণ আর প্রতিযোগিতার পর্ব

উপ-অঞ্চল, রাষ্ট্র, সামন্ততন্ত্র আর তৃতীয় নগরায়ণ: বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক আত্মপরিচয়ের উন্মেষ

এই সাম্রাজ্যেরও আস্তে আস্তে ভাঙন হয়। ছোট ছোট রাজত্ব সৃষ্টি হয়। সম্রাটদের অধীনে বা সম্রাটদের প্রতি অনুগত যে বড় বড় জমি ও ক্ষমতার মালিক ছিলেন তাদের বলা হতো মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিক বা সামন্ত। এরা অনেকেই স্বাধীন রাজত্ব তৈরি করেন। বাংলা অঞ্চলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পরে নানা রাজবংশের শাসন বিস্তৃত হয়। এদের মধ্যে গৌড় নামে যে রাজত্ব তৈরি হয়, সেই রাজত্ব বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরের বড় অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। গৌড় নামটি পরেও দীর্ঘকাল বাংলা অঞ্চলের মানুষের পরিচয় হিসেবে বলবৎ ছিল। সাধারণ অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি আগেকার পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলে নতুন এক রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। অন্যদিকে, সমতট-হরিকেল-শ্রীহট্ট অঞ্চলে (বর্তমান কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম) নতুন বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান ঘটে। যেমন : খজা, চন্দ্র, দেব ইত্যাদি। সেই সময়ে গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (বর্তমানে ভারতের পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদে)।



শশাঙ্কের সময়ের গৌড় রাজ্যের সমসাময়িক অন্যান্য রাজ্য ও রাজত্ব।



শশাঙ্কের রাজত্বের আনুমানিক বিস্তার। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশসহ ভারতের বিহারের পূর্বদিক, পশ্চিম বাংলার উত্তর ও দক্ষিণাংশের শশাঙ্কের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল।



গৌড়ের শাসক শশাঙ্কের মুদ্রা।

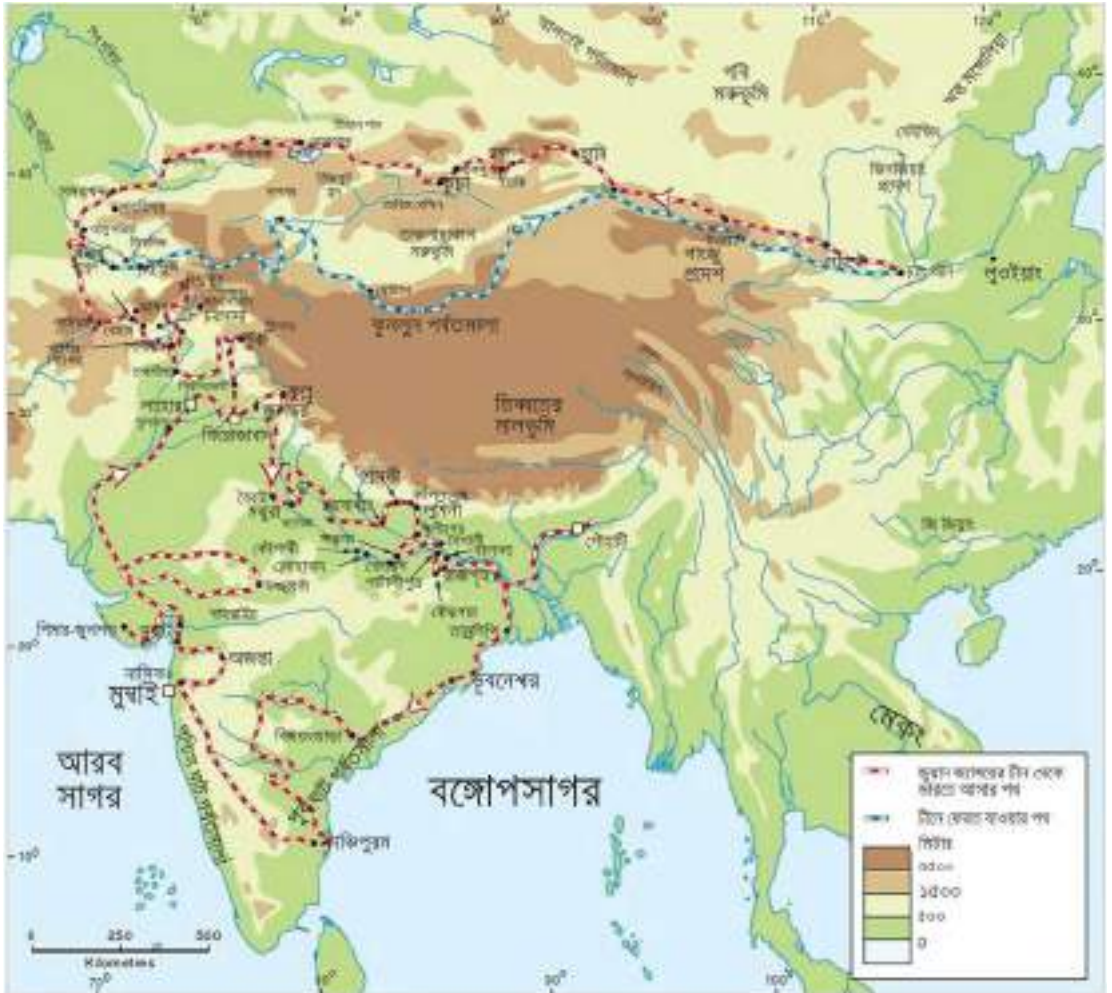
ভারত উপমহাদেশে তখন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক রাষ্ট্র বিকশিত হয়। রাজত্বের ভিত্তিতে এসব অঞ্চলকে বোঝার চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল হতে পারে। কারণ, সাধারণ অর্থ ৭ম-৮ম শতকের দিকেই বিভিন্ন জায়গায়ই ছোট ছোট অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট পরিচয়, ধর্মাচার, আচার-আচরণ, সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে শুরু করে। এসব উপ-অঞ্চলের মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশে ছিল: বঙ্গ, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল, কামরূপের একাংশ। বর্তমান পশ্চিম বাংলার পড়েছে রাঢ়। উপ-অঞ্চলগুলোর কোনো কোনোটিতে একই শাসক থাকলেও মনে রেখো, শাসকের বা রাজার পরিবর্তন মানুষের জীবনযাপন, সমাজ ও পরিচয়ের উপরে একই রকম প্রভাব ফেলে না। একই শাসক এসব রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার উপরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে যুদ্ধ ও সংঘাতে চলতে থাকে। যেমন: বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের অনেকাংশ জুড়ে পাল বংশীয় শাসকদের শাসন জারি হয়। বর্তমান ভারতের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে গুর্জর-প্রতিহার আর চান্দেলা, মধ্য ও পশ্চিমাংশে রাষ্ট্রকূট, দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে চোল, পান্ড্য, হোয়সালা, পল্লব, কদম্ব, চের ইত্যাদি বংশের শাসন চলতে থাকে। একাধিক অঞ্চলের উপরে শাসন বিস্তার নিয়ে যুদ্ধ ও সংঘাতও চলতে থাকে। কিন্তু



অবিভক্ত বাংলা ও সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ অষ্টম-নবম শতকে বিকশিত উপ-অঞ্চলগুলো।

এই সংঘাতের পাশাপাশি বাণিজ্য, কৃষিকাজ, নগরায়ণসহ নানা ক্ষেত্রে নতুন নতুন অনেক উদ্ভাবন ঘটেছে থাকে। বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য আর অন্যান্য ভাষা আর ধর্মশাস্ত্র বিকশিত হয়।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে সমতট-হরিকেল-শ্রীহট্টজুড়ে চন্দ্র, দেব, বর্মনসহ বিভিন্ন রাজবংশের শাসন বিকশিত হয়। এ সময়ে এসব অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন মতবাদ (যেমন: বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌরীয় ইত্যাদি), বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন মতবাদ (যেমন: মহাযান, বজ্রযান, থেরবাদী, সহজীয়া ইত্যাদি), জৈন ধর্মের নামা মতবাদ বিকশিত হয়। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভক্তিবাদ, তন্ত্রযানসহ বিভিন্ন ধরনের মত ও পথের অনুসারীদের বিকাশ ঘটে। ভারতের অন্যান্য অংশে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা কমে এলেও এবং পুরোনো অনেক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান যেমন: সঞ্জয়কেন্দ্রিক বৌদ্ধবিহার ও মহাবিহার গুরুত্ব হারাতে শুরু করলেও শাসকদের ও অনুগত সামন্ত আর মহাসামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশসহ তৎকালীন পূর্ব ভারতে বৌদ্ধ ধর্মীয় বজ্রযান, তন্ত্রয়ন, সহজীয়া মতের অনুসারী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়।



জুয়ান-জ্যাংয়ের সেই সময়ের ভারত উপমহাদেশ ও অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মস্থানে ভ্রমণ করা ও ফিরে যাওয়ার পথ [উপিন্দর সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত।



কেমন ছিল সেই সময়ে পুন্ড্রনগরের ভিতরের বসতি, মন্দির আর জলাশয়? শিল্পীর কল্পনায়। সূত্র: সাজিদ বিন দোজা ও ফারহানা নাজিম চৌধুরীর চিত্র অবলম্বনে রূপান্তরিত।]



বর্তমান ভারতের উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর মন্দির। কলিঙ্গরীতির মন্দির স্থাপত্যের আদর্শ উদাহরণ



চীনের বিভিন্ন সূত্রে ঐক্য জুয়ান-জ্যাংয়ের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। পরিব্রাজক জুয়ান-জ্যাংয়ের তেমনই একটি প্রতিকৃতি।

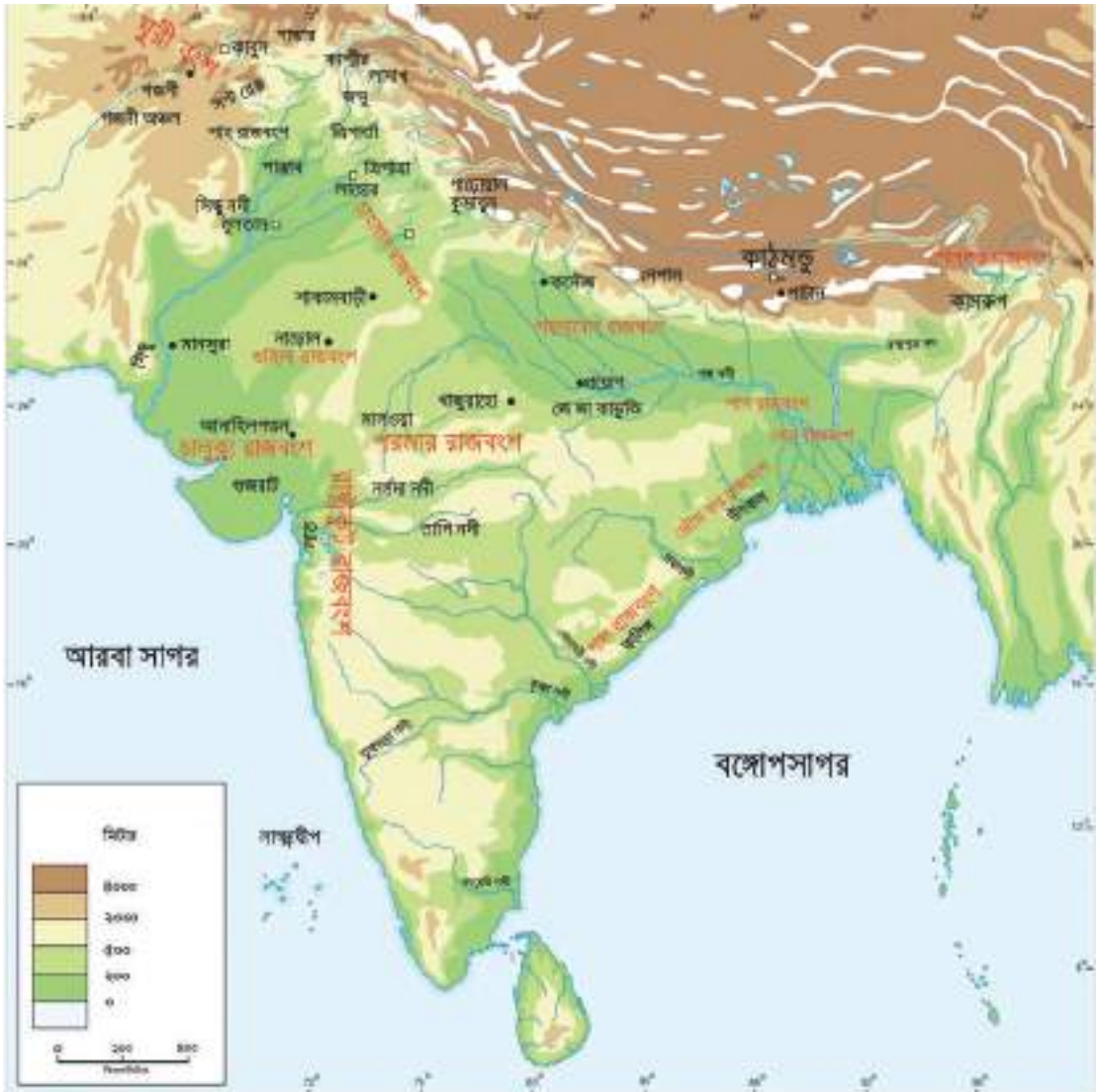


বাংলাদেশের দিনাজপুরের কাহারোলে খুঁজে পাওয়া নব-রথ হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই মন্দির আর বিরলের হিন্দু মন্দিরটির উপরের কাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে এর আগে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের যে-মুক্তেশ্বর মন্দির তোমরা দেখেছ, এই মন্দির দুটোর উপরের কাঠামো (যাকে শিখর বলা হয়) তেমনই ছিল। ফারাক হলো, মুক্তেশ্বর মন্দিরের শিখর পাথরের তৈরি। এই মন্দিরগুলোর শিখর ইটের তৈরি ছিল।



বাংলাদেশের দিনাজপুরের বিরলে খননে খুঁজে পাওয়া বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

বাংলাদেশের নওগাঁর পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার, জগদল মহাবিহার, দিনাজপুরের সীতাকোট বিহার, কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতির শালবন বিহার, বিক্রমপুরের বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহারসহ ভারতের পশ্চিম বাংলার জগজ্জীবনপুরের নন্দদিঘীকা মহাবিহার, বিহারের আনতিচকের বিক্রমশীলা মহাবিহার, নালন্দা মহাবিহারসহ অনেক সঙ্ঘ বা সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় অসংখ্য মন্দিরও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিকশিত হয়। বেশ কিছু মাটি বা মাটি-ইটের প্রাচীর ঘেরা দুর্গ বা বসতিও গড়ে ওঠে। যেমন: পঞ্চগড়ের ভিতরগড়।



বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক রাষ্ট্র ও রাজত্ব তৈরি হওয়ার সময়ে বিভিন্ন শাসকবংশের নাম ও রাষ্ট্রের অবস্থান।
[উপিন্দর সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত।]



পাল, গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকুটদের শাসনাধীনে তিনটি প্রধান রাষ্ট্র বিকশিত হয়েছিল ভারত উপমহাদেশে।



অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ। পাল যুগে লিখিত। বাংলাদেশসহ ভারত উপমহাদেশের পূর্বাংশে বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার ও মহাবিহারে এ ধরনের গ্রন্থ লিখিত ও চিত্রিত হতো।



পাল শাসনামলে তালপাতায় লিখিত ও চিত্রিত বৌদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের চিত্র ও লেখা।



আলচির গুহাচিত্রে চিত্রিত বৌদ্ধ দেবী তারার চিত্র।



আলচির গুহাচিত্রে ঘোড়সওয়ারের ছবি। আলচির এই চিত্রগুলোর সঙ্গে পাল আমলের চিত্ররীতির মিল আছে বলে ইতিহাসবিদগণ ধারণা করেন।



ভারতের বিহারে অবস্থিত নালন্দা মহাবিহারের বিহার ও মন্দিরগুলোর ছবি।



ভারতের বিহারের আন্তিচকে অবস্থিত বিক্রমশীলা মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ছবি।



বাংলাদেশের নওগাঁয় অবস্থিত সোমপুর মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরসহ ছবি।



সোমপুর মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দির দেখতে এমন ছিল বলে মনে করেন ইতিহাসবিদগণ



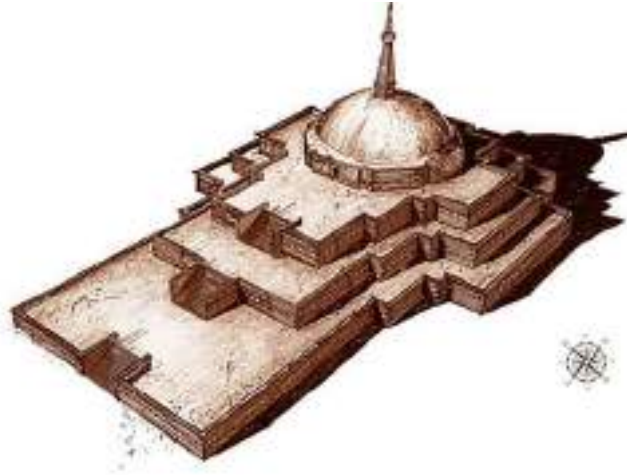
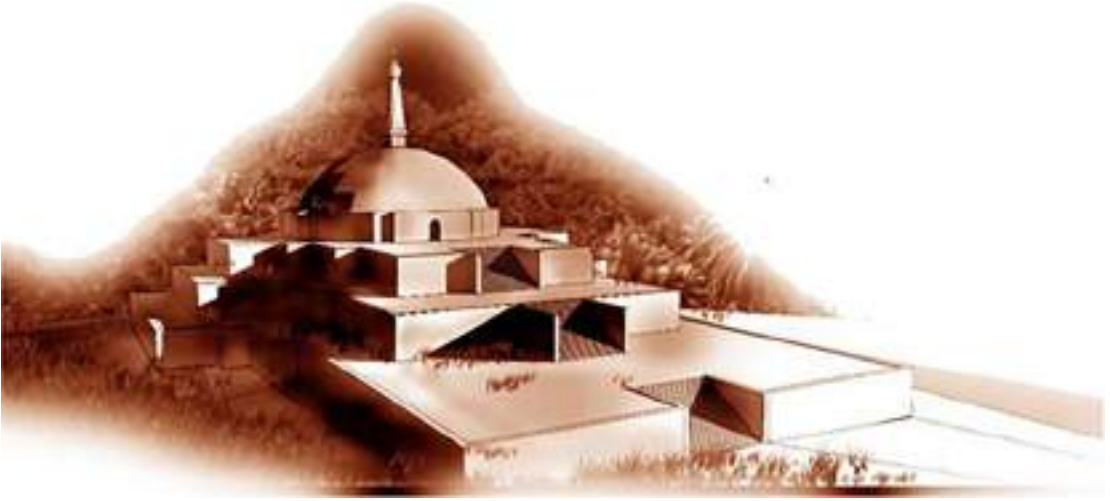
কুমিল্লার ভোজ বিহার খননে আবিষ্কৃত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় ব্রোঞ্জের তৈরি বজ্রসত্ত্ব প্রতিমা। এখন লালমাই-ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে প্রদর্শন করা হচ্ছে।



পাথরের খোদাই করা বিষ্ণু প্রতিমা।



মহাস্থানগড়ের বাইরের নগরের বসতির কাল্পনিক চিত্র। সূত্র: সাজিদ বিন দোজা ও ফারহানা নাজিম চৌধুরীর চিত্র অবলম্বনে রূপান্তরিত।]



বাংলাদেশের মহাস্থানের পুন্ড্রনগর বা মহাস্থানগড় সংলগ্ন গোকুল মেধের ধ্বংসাবশেষের উপর থেকে নেওয়া চিত্র। চারদিকে খোপ খোপ বানিয়ে একটি স্থানকে উঁচু করে তার উপরের মন্দির তৈরি করা হয়েছিল এখানে। বাংলা অঞ্চলে এই স্থাপত্য তৈরির কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে অনেক স্থানে। এই মন্দির দেখতে কেমন ছিল? পরে ছবিতে তোমরা ধারণা করতে পারবে।

গোকুল মেধ দেখতে কেমন ছিল? সাজিদ বিন দোজা ও ফারহানা নাজিম চৌধুরীর ধারণা অনুসারে এমনই ছিল গোকুল মেধের মন্দিরের চেহারা।



কড়ি:

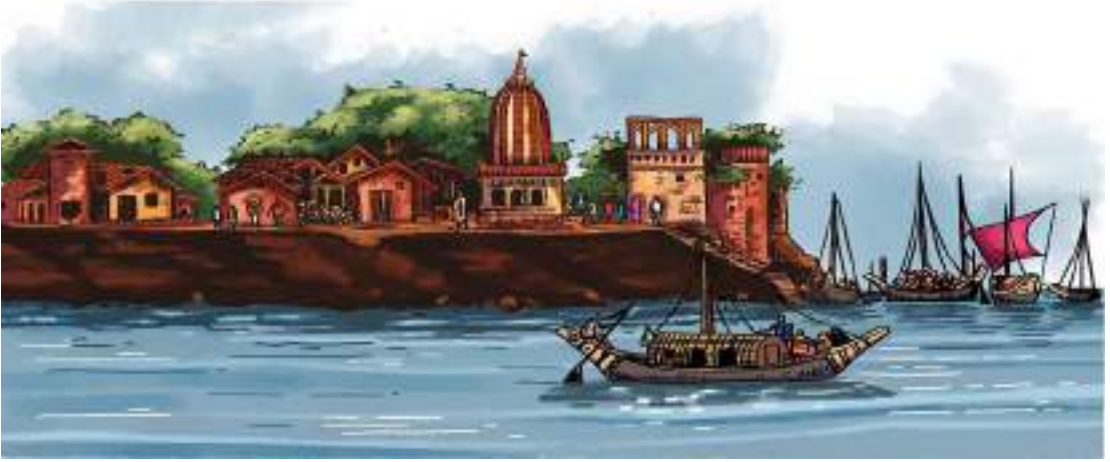
পুরো কড়ি আর একদিকে কাটা কড়ি। এই কড়িই আনু. ১৬শ-১৭শ শতক পর্যন্ত মুদ্রা বা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বাংলা অঞ্চলে চালু ছিল। আঞ্চলিক বিভিন্ন রাজত্ব বিস্তারের সময়ে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাংশে ও দক্ষিণাংশে এই কড়ি ছিল অন্যতম মুদ্রা। তখন খাতব মুদ্রা চালু ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বাংশে সমতট ও হরিকেল অঞ্চলে কড়ির পাশাপাশি। তোমাদের এখন শুনে অবাক লাগতে পারে। এখনো আমাদের ভাষায় কড়ির একসময়কার এই গুরুত্ব আর টাকা হিসেবে এর ব্যবহারের ইজ্জিত পাবে। তোমরা হয়তো পড়বে, ‘কপর্দকহীন’ (মানে, সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব)। এই কপর্দক শব্দের অর্থ কিন্তু কড়ি। আবার পড়বে ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’ কিংবা ‘কানা কড়িরও দাম নাই’। এসব শব্দ বা বাগধারা এখনো আমাদের বাংলা ভাষায় টিকে আছে। যদিও কড়ি আর আমরা টাকা হিসেবে বা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করি না। কিন্তু প্রতীকীভাবে এখনো কড়িকে ধন-সম্পদ, বা টাকা-কড়ি হিসেবে অনেকেই বিবেচনা করেন। কড়ি যদি ফুটা বা ভাঙা হয় সেই কড়ির কোনো মূল্য বা দাম নেই। ওই সময়ের লিখিত বিভিন্ন উৎসে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে আরও নানা মানদন্ডের নাম পাওয়া যায়। তবে সেগুলোর কোনোটাই বস্তুগতভাবে পাওয়া যায় নাই। তোমরা আরো বিস্মিত হবে জানলে। এসব কড়ি সমুদ্রর শামুকের একটি প্রজাতি। আর পাওয়া যায় একমাত্র মালদ্বীপে। তখন বাংলা থেকে মালদ্বীপে চাল রপ্তানী করা হতো। আর কড়ি আমদানি করা হতো। বাংলায় এই কড়ি কেবল মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃতই হতো না। বাংলা থেকে কড়ি রপ্তানি করা হতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আর ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকার নানা অঞ্চলে। তখন কড়ির দাম আসলেই অনেক ছিল।





সে-সময়ের অনেক নগরকেন্দ্রই বড় প্রাচীর বা দেয়াল দিয়ে ঘিরে সুরক্ষিত করা হতো। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি নগরে বসবাস করা অভিজাত শ্রেণির মানুষজন নগরের বাইরের মানুষজনের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়াও একটা কারণ ছিল। ভারত উপমহাদেশের অনেক নগর কেন্দ্রের চারপাশের এই প্রাচীর বা উঁচু দেয়াল পাথর দিয়ে বানানো হতো। অনেক সময় একাধিক প্রাচীর থাকতো। মাটির তৈরি, ইটের তৈরি আর ইট ও মাটির তৈরি। বাংলাদেশে বেশির ভাগ প্রাচীরই হয় মাটির, নয়তো ইটের তৈরি ছিল। বিভিন্ন সময়ে এই প্রাচীরগুলো ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে গেছে। প্রাচীরের পুরোটা বা আংশিক, উপরের দিকে বেশ প্রশস্ত হতো। প্রাচীরের বাইরের দিকে থাকতো গোলাকার বুরুজ। এই বুরুজের উপরে রক্ষীরা থাকতো। প্রশস্ত অংশ দিয়ে রক্ষীরা আসা যাওয়া করত। এসব বুরুজে দাঁড়িয়ে দূরের জিনিস যেমন দেখা যেতো, তেমনই কেউ হামলা করলে এই বুরুজের উপরের রক্ষীরা তাদের হামলা ঠেকানোর চেষ্টা করত। তীর-ধনুক, বর্শা, বা অন্য কোনো অস্ত্র ব্যবহার করে। পরে মধ্যযুগে এ ধরনের দুর্গের প্রাচীরের উপরে কামান বসানো থাকত। মহাস্থানগড় বা পুন্ড্রনগরের করতোয়া নদীসংলগ্ন দিকের এই প্রাচীরের ছবিটি কল্পনা করে ঐকেছেন স্থপতিগণ। [সূত্র: সাজিদ বিন দোজা ও ফারহানা নাজিম চৌধুরীর চিত্র অবলম্বনে রূপান্তরিত।]





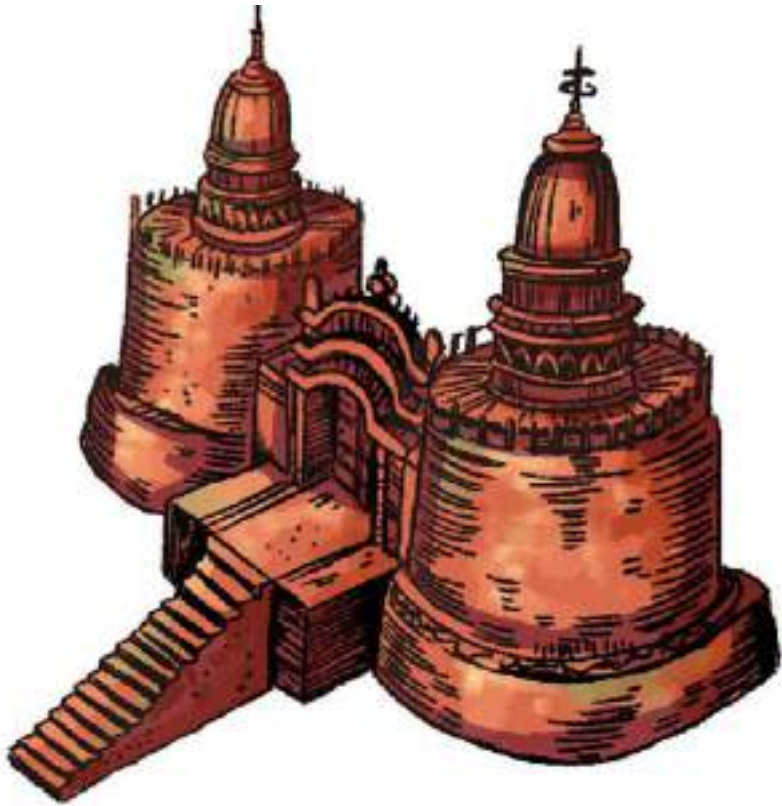
মহাস্থানগড় ও করতোয়া নদীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ছিল। পুন্ড্রনগর গড়ে উঠেছিল করতোয়া নদীকে কেন্দ্র করে। নদীটি ছাড়া এই নগরকেন্দ্রটি বিকশিত হত না। টিকে থাকতে পারতো না। তোমরা এই নগরকেন্দ্রের সঙ্গে করতোয়া নদীর সম্পর্ক কেন এত ঘনিষ্ঠ ছিল বলতে পারবে? এখনো বাংলাদেশে বেশিরভাগ শহর-গঞ্জ-হাট নদীর তীরের অবস্থিত। নদীগুলোর অনেকগুলোই আর আগের মতন পানি বহন করে না। অথবা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু পুরানো হাট-বাজার-গঞ্জ-শহর এখনো নদীর তীরেই রয়েছে। নদী যখন তার প্রবাহপথ পাল্টেছে বা এক খাত থেকে অন্য খাতে সরে গেছে বসতিগুলোও স্থানান্তরিত হয়েছে। এখন রাস্তার মাধ্যমে হয়ত যোগাযোগ ও পরিবহন সহজ হয়েছে। কিন্তু আগে যখন নদীগুলোতে সারাবছর পানি থাকত তখন নদীগুলোই ছিল চাষাবাদ, যোগাযোগ, বাণিজ্যের প্রধান পথ। অনেকটা আমাদের শরীরের রক্তনালীর মধ্যের রক্তপ্রবাহ যেমন আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, নদী ও তার মধ্যের বৃষ্টির পানিপ্রবাহ বাংলাদেশের মানুষ, জমি ও যোগাযোগকে হাজার হাজার বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। নদীকেন্দ্রীকতা আর নদীর উপরে নির্ভরশীলতা ছাড়া বাংলাদেশে মানুষের বসতি গড়ে ওঠা আগেও সম্ভব ছিল না। এখনও কঠিন। [ছবিটি কল্পনা করে আঁকা। সূত্র: সাজিদ বিন দোজার চিত্রের রূপান্তরিত রূপ]



পুন্ড্রনগরের চারপাশের প্রাচীর এখন ভেঙে গেছে। সেই সময়ের প্রবেশদ্বারগুলোর নিচের ভাঙ্গা অংশ আমরা খুঁজে পাই। কিন্তু তখন প্রবেশদ্বারগুলো দেখতে কেমন ছিল? তোমরা উপরের ছবি দুটো দেখে ধারণা করতে পারবে। [সূত্র: সাজিদ বিন দোজার চিত্র থেকে রূপান্তরিত]



করতোয়া নদী হয়েও নৌযানের নগরে প্রবেশের দরজা ছিল পুন্ড্রনগরে। সেই প্রবেশ দরজার কল্পিত চিত্র।
সাজিদ বিন দোজার চিত্র থেকে রূপান্তরিত।

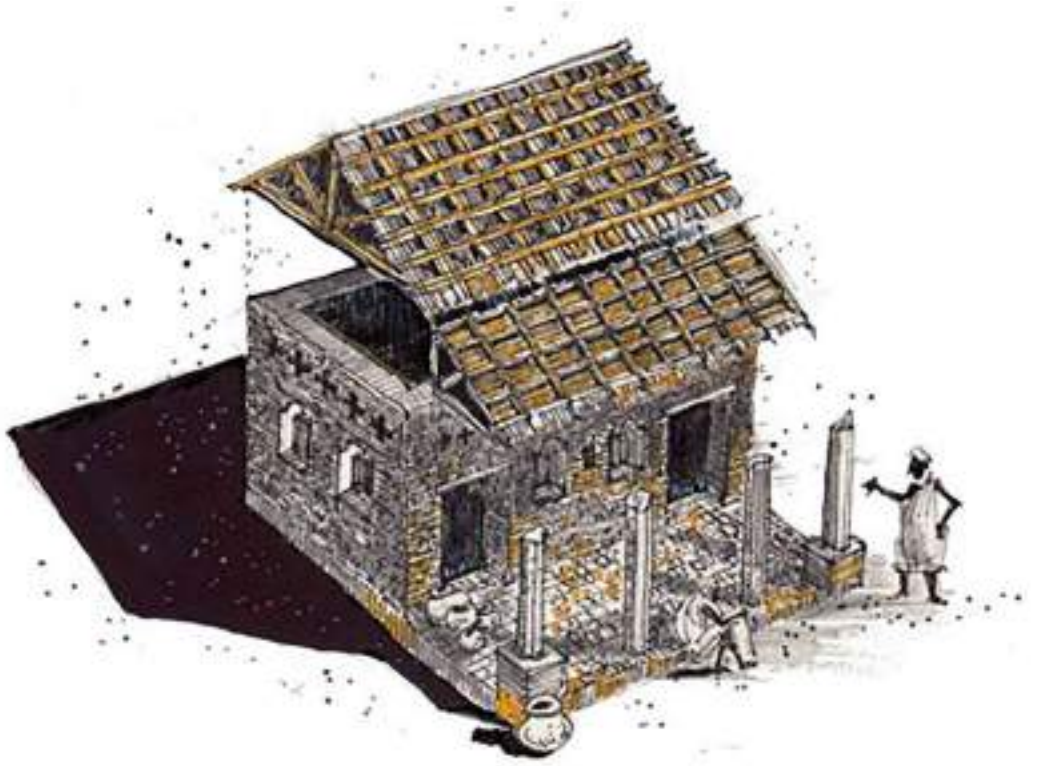




মহাস্থানের নগরের বাইরের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ও বসতি কেমন ছিল? [সূত্র: সাজিদ বিন দোজার কল্পিত চিত্রের রূপান্তর]



মহাস্থানের সাধারণ মানুষ কেমন ঘরবাড়িতে থাকতেন? [সাজিদ বিন দোজার কল্পনার রূপান্তরিত চিত্ররূপ।]



পুন্ড্রনগরের মানুষজন কেমন বাড়িতে থাকতেন? [সাজিদ বিন দোজার কাল্পনিক চিত্র]

আমরা এ পর্যন্ত অনেকগুলো প্রাচীন স্থাপনার ছবি ও মডেল দেখলাম। এ অধ্যায়ে পরেও আমরা এরকম অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের ছবি দেখতে পাব। তোমার আশপাশে বা কাছাকাছি এ রকম যেকোনো একটি স্থাপনা/ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান মা, বাবা, শিক্ষক বা বড়দের সহায়তায় দেখে আসবে এবং সেটি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তোমার ভ্রমণ ডায়েরিতে লিখবে।



রানির বাংলা প্রত্নস্থানের মন্দির



শালবন বিহার



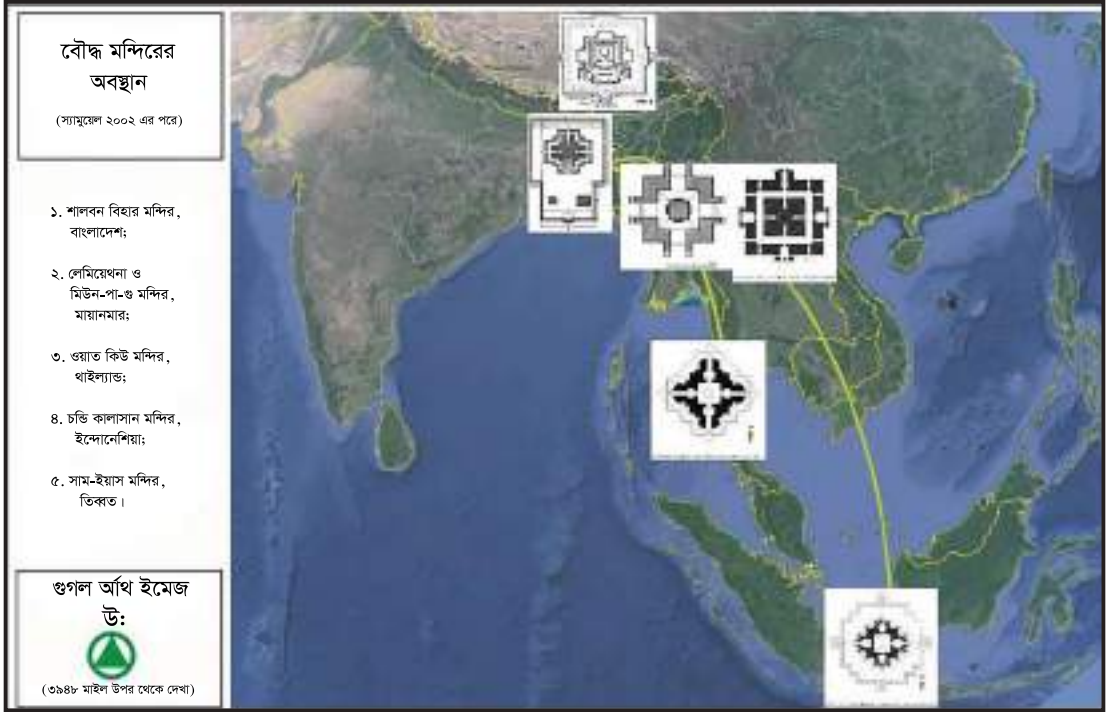
লতিকোট বিহার



রূপবান মুড়া



চারপত্র মুড়া



বাংলা অঞ্চলের বৌদ্ধ মন্দির স্থাপত্যরীতি দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির স্থাপত্যরীতিকে প্রভাবিত করেছিল। লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলের শালবন বিহার, আনন্দ বিহারসহ বেশ কয়েকটি বৌদ্ধমন্দিরের গঠন ও আকার বিভিন্ন অঞ্চলের স্থাপত্যর গঠন ও আকার দেওয়ায় বড় ভূমিকা রেখেছিল। এই মানচিত্রে তেমনই কয়েকটি স্থান ও মন্দিরের ছবি ও অবস্থান দেখানো হয়েছে।



বাগান, মিয়ানমার



পু, মিয়ানমার



জাভা, ইন্দোনেশিয়া



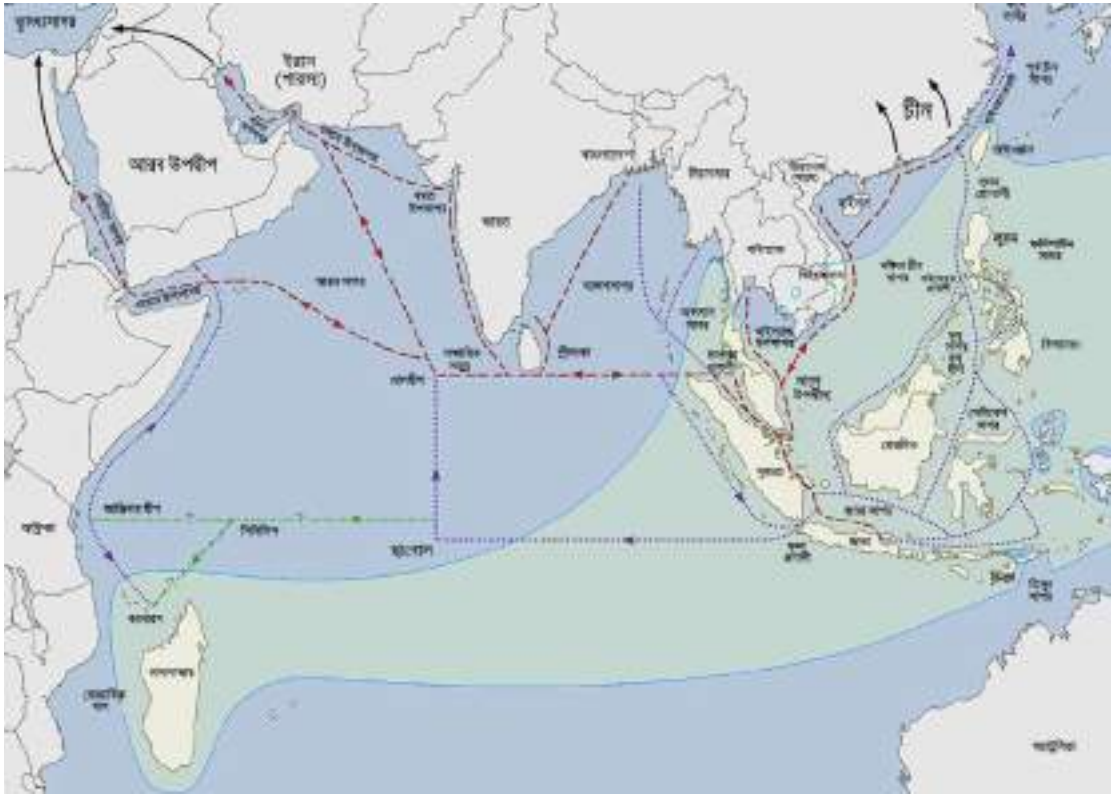
থাইল্যান্ড



তিব্বতের বৌদ্ধমন্দির



হরিকেল মুদ্রা (বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রচলিত মুদ্রা) আর আরাকানে প্রচলিত মুদ্রার মধ্যে চিত্রের সাদৃশ্য। এই অঞ্চলে কড়ির পাশাপাশি ধাতব মুদ্রাও প্রচলিত ছিল।



ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর এবং চীন সাগরসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের পথ ও বিস্তৃতি।

এই সময়েই ভারত উপমহাদেশ জুড়ে নতুন নতুন অনেক নগরকেন্দ্র গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় নগরায়ণের সময় তৈরি হওয়া অনেক নগর-কেন্দ্র ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র তাদের গুরুত্ব হারায়। কিছু কিছু নগরের গুরুত্ব বেড়ে যায়। আবার নতুন নতুন নগর ও শহর, নতুন ব্যবসা ও বাণিজ্যিকেন্দ্র তৈরি হয়। বাংলা অঞ্চলের ক্ষেত্রে বসতি ও নগর বিকাশের ক্ষেত্রে নদীব্যবস্থা খুব বড় প্রভাব ফেলেছিল। মহাস্থানগড় বা প্রাচীন পুন্ড্রনগর বিকশিত হয়েছিল করতোয়া নদীর তীরে, বানগড় বা কোটিবর্ষ বিকশিত হয়েছিল পুনর্ভবা নদীর তীরে। ভিতরগড় বা ধর্মপাল রাজারগড়সহ প্রাচীরঘেরা বিভিন্ন বসতি বিকশিত হয়েছিল নদীর তীরে। নতুন নগর বিকশিত হওয়ার অর্থ হলো কৃষির প্রসার ও কৃষিজাত পণ্য অতিরিক্ত থাকার কারণে নগরের বিভিন্ন পেশার মানুষজন যারা চাষাবাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না তাদের খাওয়াদাওয়াসহ বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হওয়া। বড় বড় স্থাপনা, ধর্মীয় স্থাপত্যসহ নানা বসতি নির্মাণের জন্য কারিগর শ্রেণি, স্থপতি, কর্মকার, মাঝি, চর্মকার, তাঁতিসহ নানা পণ্য উৎপাদনকারী, সামন্তশ্রেণির প্রতিনিধিদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কৃষিজ পণ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।



চর্যাপদের তালপাতার পান্ডুলিপি

চর্যাপদ অনেকজনের লেখা পদ বা কবিতার একটি সংগ্রহ। এই সংগ্রহের পান্ডুলিপিটি খুঁজে পান পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তৎকালীন সহজীয়া বৌদ্ধ পথের অনুসারীদের লিখিত এই পদগুলো যে ভাষায় লিখিত হয়েছিল সেই ভাষা থেকেই বাংলাসহ অসমীয়া, উড়িয়া ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। কবিতাগুলোর ভাষায় সহজীয়া পদলেখকগণ সরাসরি বিভিন্ন প্রসঙ্গ না বলে রহস্যময় ভঙ্গিতে বলেছেন। সে জন্য এই ভাষাকে সাক্ষ্যভাষা বলা হয়। তবে এই পদ বা কবিতাগুলো সাধারণ ৮ম শতক থেকে সাধারণ ১২শ শতকের মধ্যে লেখা। ওই সময়ের বাংলাসহ ভারত উপমহাদেশের পূর্বাংশের সমাজ, জীবনসহ নানা বিষয় সম্পর্কে এই পদগুলো থেকে ধারণা পাওয়া যায়। মানুষের দারিদ্র্য, উঁচু-নীচু ভেদাভেদ, বৈষম্য আর সহজ বিভিন্ন পথে সাধনার মধ্য দিয়ে ধর্মাচারণের নানা উদাহরণ এই পদগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধবিহার ও মহাবিহারগুলো আর মন্দিরগুলোকে অনেক জমি দান করা শুরু হয়েছিল। এই জমিতে উৎপন্ন কৃষিজপ্য মহাবিহারে বা বিহারে বসবাসকারী বৌদ্ধ বা অন্যান্য সংসারত্যাগী সাধকদের খাওয়া-দাওয়া, দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল। গ্রামাঞ্চলে হাট, বাজার আর ব্যবসায়ীদের সংগঠন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ব্যবসা ও বাণিজ্য স্থানীয় পর্যায়ে থেকে আন্তঃদেশীয় পর্যায়ে প্রসারিত হয়েছিল। নদী ও স্থলপথে পণ্য আনা-নেওয়া ও ব্যবসার পাশাপাশি অনেক পণ্য উপকূলে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্য পাঠানো হতো।

স্থাপত্য ও শিল্পকলায় এতসব অর্জনের পরেও একটা কথা ভুললে চলবে না যে, সাধারণ মানুষের জীবন তখনও দারিদ্র্য ও কষ্টে কাটতো। নানা ধরনের লিখিত সূত্র আর তাম্রলিপি বিশ্লেষণ করে ইতিহাসবিদগণ দেখিয়েছেন যে, সাধারণ কৃষক, কারিগর, তাঁতি, জেলসহ নানা পেশার মানুষজনের জীবন বেশ কঠিন ছিল। শাসক, সামন্ত, জমির মালিক সম্পন্ন কৃষক, আর জাতি বর্ণ প্রথার বৈষম্যের কারণে সমাজের বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবন দারিদ্র্য ও কষ্টে কাটতো। যে কারিগরগণ এসব বড় বড় স্থাপত্য তৈরি করেছিলেন, তারা যে খুব আরাম-আয়েশে ছিলেন না সেটা স্পষ্ট। যে কারিগরগণ পাথর খোদাই করে ভাস্কর্য তৈরি করতেন তাদের সামাজিক মর্যাদা খুব উপরে ছিল না।

চলো আমরা আমাদের কাছাকাছি যেকোনো একটি কারিগর শ্রেণি যেমন- কামার, কুমার, স্থপতি, কর্মকার, মাঝি, চর্মকার, তাঁতি, চাষি এদের কাছে যাই। তাদের করা কাজ সম্পর্কে জানি এবং তাদের কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ছবি ঐকে বা লিখে একটা প্রতিবেদন তৈরি করি।

এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্য বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রা হিসেবে ধাতব মুদ্রা এবং কড়ির প্রচলন ছিল। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কড়ির পাশাপাশি ধাতব মুদ্রা ব্যবহৃত হতো। অন্যদিকে, বরেন্দ্র ও বঙ্গ অঞ্চলে কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের উপকূলীয় বন্দরগুলো থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া থেকে চীনের ইউনান পর্যন্ত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ভারতের পূর্ব উপকূলের নানা বন্দরের সঙ্গেও সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলতো।



বাংলা অঞ্চল থেকে কাপড়, কাঠ, সুগন্ধি, চাল, লবণসহ নানা ধরনের পণ্য বাইরে পাঠানো হতো। মৌর্য আমল থেকেই বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা হয়ে নানা ধরনের পণ্য বর্তমান ভারতের পূর্ব উপকূলীয় ও পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলো থেকে বর্তমান ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, আফ্রিকা ও ইউরোপে পাঠানো হতো। অন্যদিকে, বাইরে থেকেও মসলার মতন নানা ধরনের পণ্য বাংলা অঞ্চলের বন্দরগুলো হয়ে স্থলপথে ও জলপথে উত্তর ভারত এবং পূর্ব ভারতের নানা অঞ্চলে যেতো। ইউরোপে ও এশিয়ার নানা অঞ্চলে যেতো। যে কড়ি মুদ্রা হিসেবে বাংলায় জনপ্রিয় ছিল সেই কড়ির বেশির ভাগই আনা হতো বর্তমান মালদ্বীপ থেকে। মালদ্বীপে পাঠানো হতো চাল। বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগর হয়ে এই সামুদ্রিক বাণিজ্য আর হিমালয় পর্বতের পাদদেশ হয়ে রেশম পথ হয়ে স্থল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা ও বর্তমান ভারতের আসাম, ভুটান, নেপাল আর তিব্বতের মাধ্যমে এই বিশাল বাণিজ্যিক পথ নানা জায়গায় বিস্তৃত ছিল। তোমরা শুনলে অবাক হবে— এ সময়ে বাইরের গুপ্তানি করা পণ্যের মধ্যে ছিল নারিকেল, সুপারি, লবণ, এমনকি গন্ধারের শিং। কাপড়, চিনি, জাহাজসহ আরও নানা পণ্য ও প্রযুক্তি অনেক দূরে বাণিজ্যিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল।



পালোয়ার



মগ নৌকা
(সুন্দরবনে প্রচলিত)



তমলুক
(লবণ পরিবহনে ব্যবহৃত)

মজার ব্যপার কি জানো, এ অঞ্চলের সামুদ্রিক বাণিজ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল বাংলাসহ ভারত উপমহাদেশের আর আরবীয় বণিকগণ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যেও এই অঞ্চলের বণিকদের বড় ভূমিকা ছিল। যেমন ছিল চীনসহ আরও নানা দেশের বণিকদের। আমরা যদি মনে করি জাহাজ, অ্যারোপ্লেন,



বেদি-বাশরি
(যাতায়াত ও পরিবহন)



ভেদি বালাম
(বাণিজ্য, পরিবহন,
নিজস্ব ব্যবহার)

বাংলার নদীনালা, খালবিলে, সমুদ্রে বিচরণ করত বিভিন্ন ধরনের নৌকা। সেসব নৌকার অনেকগুলোই এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষজন এখন ইঞ্জিনচালিত কয়েকটা ধরনের নৌকা ব্যবহার করেন মাত্র। সেসব নৌকার ইতিহাস জেনে আমরা মানুষের খাদ্যাভ্যাস, বাণিজ্যের ধরন, জলপথের প্রকার নিয়ে জানতে পারি। নদী ও জলের বাংলাদেশে নৌকা ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল সেই সময়। (সূত্র: স্থাপত্য.কম)

রেলপথের মাধ্যমে এখনই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশি হয়, তাহলে সেটা ভুল হবে। বাংলাসহ পূর্ব ভারতের কারিগরগণ সামুদ্রিক এই বাণিজ্যের জাহাজ ও নৌকা তৈরি করার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ইউরোপীয় বণিকগণ খুব কমই এই বাণিজ্য পথগুলোর নিয়ন্ত্রণ করতো।

ইউরোপের অনেক দেশের বাজারে বহু পণ্য যেতই এসব বাণিজ্যপথ হয়ে। বাংলার রেশম কাপড়ের চাহিদা ব্যাপক ছিল। বর্তমান ভারতের আসাম-মেঘালয় থেকে বনজ বিভিন্ন পণ্য ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী হয়ে নানা দিকে পাঠানো হতো।

এই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুব বড় ভূমিকা রেখেছিলেন সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক ও অনুসারী। ভারতের পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বাংলা ও বিহারে অবস্থিত বিভিন্ন বৌদ্ধ মহাবিহার/বিহারগুলোর চীন, তিব্বতসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে শিক্ষার জন্য ও বৌদ্ধ বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা আসতেন। ঠিক তেমনই এই অঞ্চল থেকে অনেকেই যেতেন তিব্বত, চীনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে।

এদের এই যোগাযোগের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের পথগুলোও খুলে যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক ও বণিকদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে। এমনকি এক শাসকের সঙ্গে আরেক শাসকের কূটনৈতিক যোগাযোগও ঘটে। চীন থেকে আসার সূত্রপাত ঘটেছিল আরও আগে। সেটা তোমরা জানো। এমন দুজন খুবই বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ ধর্মীয় পর্যটক ছিলেন জুয়ান-জ্যাং (হিউয়েন-সাং নামে পরিচিত) আর ই-জিং (যিনি ফা-হিয়েন নামে পরিচিত)। এসব বৌদ্ধ পণ্ডিতদের ভ্রমণকাহিনি ওই সময়ের

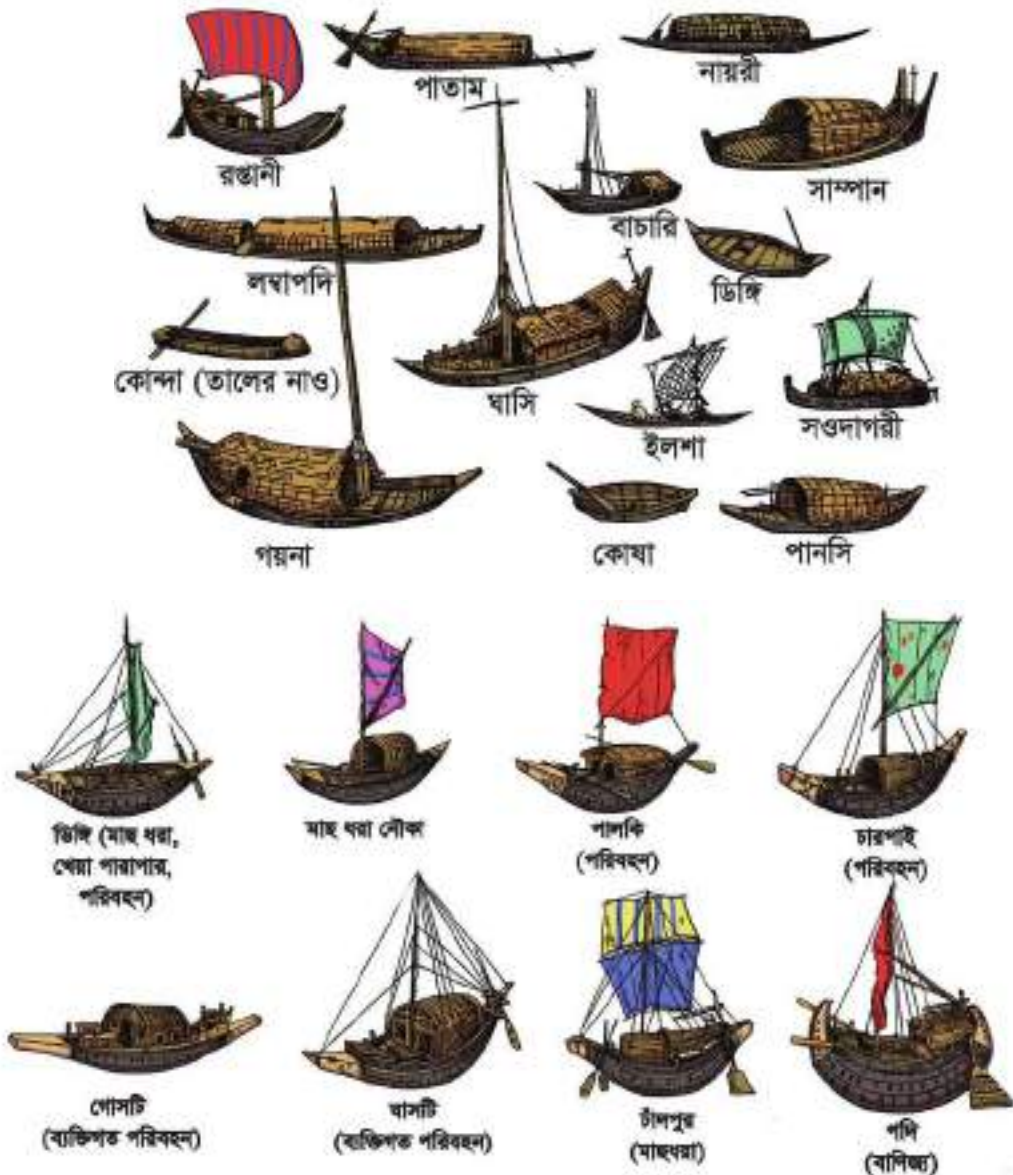


অজন্তার গুহাচিত্রে আঁকা সমুদ্রগামী জাহাজ



ইন্দোনেশিয়ার বরোবুদুর মন্দিরে খোদাই করা সামুদ্রিক বাণিজ্যের জাহাজ।

নানা স্থান, নগর, বসতি, নদী, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান করে। বিভিন্ন অঞ্চলের পরিচয় আর বিনিময়ের ধরন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর সমাজের বৈশিষ্ট্যাবলিও তাদের বিবরণী থেকে জানা যায়। অন্যদিকে, বাংলা ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে যে-সকল বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষক তিব্বতে গিয়েছিলেন শিক্ষা প্রদানের জন্য, তাদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর সর্বাগ্রে। আরও আছেন শান্তিরক্ষিত ও বিভূতিচন্দ্র। ভাষার ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ সহজীয়াদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলা ভাষায় লেখা সবচেয়ে পুরোনো যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে সেই চর্যাপদ প্রধানত সহজীয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখা বিভিন্ন পদ বা কবিতা। সেই লেখাও এই সময়ের। ভাষাগত পরিচয়, নির্দিষ্ট আঞ্চলিক পরিচয়, আচার-আচরণ এবং জীবনযাপনের নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক ধরন এই সময়েই আকার পেতে শুরু করে।



আমরা তো দেখলাম নদী/ সমুদ্রপথ যেমন যোগাযোগে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে আবার নদী বা অন্যান্য স্বাদু পানির জলাশয় কৃষিকাজসহ আমাদের দৈনন্দিন কাজেও অনেক ভূমিকা রাখে। তোমার আশপাশেও নিশ্চয় এমন জলাশয়/ নদী/ সমুদ্র আছে বা আগে ছিল। তুমি এসব জলাশয়/ নদী/ সমুদ্র সম্পর্কে বড়দের কাছ থেকে জেনে নাও, এসব জলাশয়/নদী/সমুদ্র থেকে আগে মানুষ কী কী উপকার পেতো বা এখন কী কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে সে বিষয়গুলো ছবি ঐকে বা লিখে ক্লাসের বন্ধুরা মিলে একটি দেয়ালিকা তৈরি করো।